মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধের বিচারে তাজউদ্দিন আহমদের ভূমিকা

ঢাকা শাহবাগ থেকে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বর থেকে আলুপট্টির মোড়। খুলনার শিববাড়ী মোড় থেকে বরিশাল এর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। বগুড়ার সাত মাথা থেকে যশোর চিত্রার মোড়। কুমিল্লার কান্দিরপাড়া থেকে কুষ্ঠিয়ার থানা মোড়। প্রতিবাদ এর সুঁতোয় গাঁথা বাংলাদেশ–আজকের দিনে এই প্রতিবাদ তরুণ প্রজন্মের, এই প্রতিবাদ আমাদের সবার, এই প্রতিবাদ সারা বাংলার । সর্বত্রই যুদ্ধাপরাধীদের **" ফাঁসি চাইবার-প্রতিবাদ"... রাজাকার এর ফাঁসি চাই"...** এই হল বাঙ্গালি জাতির প্রতিবাদ এর স্লোগান ।

কিন্তু এর ও বহুকাল আগেই ১৯৭১ সাল থেকেই মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য দাবি করে গেছেন যে **মহান নেতা** তিনি হলেন **বাংলার তাজ–মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক উদ্যোক্তা ও জনক... '*তাজউদ্দীন আহমদ*'।**

তাজউদ্দীন আহমদ (২৩ জুলাই ১৯২৫–৩ ডিসেম্বর ১৯৭৫) ছিলেন বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ন সেরা রাজনৈতিক নেতার একজন ও বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন এর সময় আওয়ামীলীগ এর সাধারন সম্পাদক ও মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ।

মহান মুক্তিযুদ্ধের বাংলার **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের** অনুপ্রেরণা যেমন আমাদের দেশের নিরস্ত্র বাঙ্গালির শক্তি ছিল তেমনি যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা–ত্যাগ–বিচক্ষনতা না থাকলে আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশে বুক ফুলিয়ে বাঁচতে পারতাম না তিনি **আর্দশবাদী নেতা বাঙ্গালির ভালবাসার ধন্য সন্তান "তাজউদ্দীন আহমদ** "।

একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র হাতে দেশ স্বাধীন করেছেন । পাকিস্থানী সেনারা সোহ'রাওয়াদী উদ্যানে **১৯৭১** এর ডিসেম্বর মাসে আত্মসমপর্ণ করেছিল । কিন্তু তাদের যেমন সহযোগীতা ছিল দেশ কে রক্ষা করায় তেমনি অসহযোগিতা ছিল **দেশদ্রোহী রাজাকার , আল-বদরদের, এরাই মানবতাবিরোধি ও যুদ্ধাপরাধী , ১৯৭১** সালে এরাই করেছে পাক-হানাদারদের সাথে সখ্যতা । এই রাজাকারেরাই চালিয়েছে দেশে তান্ডব, জ্বালিয়েছে ঘর বাড়ি , মেরেছে মানুষ , কেড়েছে মা-বোন এর ইজ্জত... ।

যুদ্ধচলাকালীন সময় থেকেই তাজউদ্দীন আহমদ ঐ **সব নিকৃষ্ট বাংলার মীরজাফরদের** বিচার এই বাংলার মাটিতে দাবী করে এসেছেন ।

তাই তাজউদ্দীন আহমদের মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধের বিচারে ১৯৭১ এ কী ভূমিকা ছিল , তাঁর কী বক্তব্য ছিল এবং সর্বোপরি ব্যক্তি তাজউদ্দীন আহমদ এর পরিচয়ই এই রচনায় আলোচনার গুরত্ব রাখে । অসম্ভব সৎ-নীতিবান ও মেধাবী এই রাজনীতিবীদ এর অবদান এককথায় অনস্বীকার্য ।

ব্যক্তি তাজউদ্দীন আহমদঃ

জন্ম গ্রহন -

তাজউদ্দীন আহমদের জন্ম **২৩ জুলাই ১৯২৫ সালে ঢাকা থেকে সড়ক পথে ৮২ কিলোমিটার দূরবর্তী কাপাসিয়া থানার দরদরিয়া গ্রামে ।**

পারিবার -

সাধারণ মধ্যবিত্ত রক্ষনশীল মুসলিম পরিবারে জন্ম হয়েছিল বাংলার তাজের। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াসীন খান এবং মাতার নাম মেহেরুন্নেসা খানম। তাঁর ভাই-বোন মোট ছিলেন দশ জন , চার ভাই ও ছয় বোন । তিনি ২৬ এপ্রিল ১৯৫৯ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন , তাঁর স্ত্রীর নাম **সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন আহমদ (সৈয়দা জোহরা খাতুন লিলি)**।তিনি তিন কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক ।

শিক্ষা গ্রহণ-

রক্ষনশীল মুসলিম পরিবারের সন্তান হিসাবে তাজউদ্দীন আহমদের শিক্ষা জীবন শুরু হয় তাঁর বাবার আরবি শিক্ষার মাধ্যমে । একই সময় তিনি ভর্তি হন বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার দূরবর্তি ভুলেশ্বর প্রাইমারি স্কুলে । এরপর কাপাসিয়া মাইনর ইংরেজি স্কুলে । ভাল ছাত্র হিসেবে তিনি তখনি নজরে পড়েন্ দুজন প্রবীণ বিপ্লবী নেতার । তাদের সুপারিশে স্কুলের শিক্ষক দ্বারা তিনি আরো ভাল স্কুলে যাবার সুযোগ পান , ভর্তি হন কালিগঞ্জের সেন্ট নিকোলাস ইনিস্টিটিউশনে । এখানে ও তিনি মেধার পরিচয় দেন আর পরবর্তিতে ভর্তি হন ঢাকার মুসলিম হাই স্কুলে , তারপর সেন্ট গ্রেগরীজ হাই স্কুলে ।

১৯৪৪ সালে ম্যাটিকশাকুলেশন পরীক্ষাতে তিনি প্রথম বিভাগে দ্বাদশ হয়ে উর্ত্তীণ হন । ১৯৪৮ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক এ তিনি প্রথম বিভাগে চতুর্থ হন। তিনি ছিলেন একজন কুরানের হাফেজ । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪২ সালে তিনি সিভিল ডিফেন্সে ট্রেনিং নেন , তিনি আজীবন বয়স্কাউট আন্দোলন এর সাথে যুক্ত ছিলেন ।

তাজউদ্দীন আহমদ স্কুল থেকেই রাজনীতি তথা প্রগতিশীল আন্দোলন এর সাথে যুক্ত ছিলেন , যুক্ত ছিলেন সমাজসেবায় । একারণে তার শিক্ষা জীবনে বারংবার ছেদ ঘটেছে । তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন ।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নিবার্চনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে অংশ নেয়ার কারণে তাঁর এম,এ পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি । এদিকে এম,এল,এ নির্বাচিত হবার পর ও তিনি আইন এর ক্লাস করেছেন , জেলে বন্দি থাকাকালীন তিনি আইন পরীক্ষা দেন ও আইন এ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ।

মানবতার পূজারী-

বাংলার ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষে অগণিত মানুষের খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ তাজউদ্দীন আহমদের মনকে প্রবল্ ভাবে নাড়া দেয় । দুর্ভিক্ষের পর কেউ যাতে মারা না যায় সেজন্য তিনি **" ধর্মগোলা"** নামে ঐ গ্রামের লোকজন দ্বারা সংঘঠিত গ্রাম পর্যায়ের অশ্রুত এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন ।ফসল ওঠার মওসুমে ধনীদের কাছ থেকে শস্য এনে গোলায় জমা হতো, যাতে তৎক্ষনাত ক্ষুর্ধাতকে খাদ্য দেয়া সম্ভব হয় ।

আর্তের সেবায় তার কোন ক্লান্তি ছিল না, তাজউদ্দীন আহমদ নিজ প্রচেষ্টাতে ও উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার করেছেন । সেখানে তিনি একাডেমিক শিক্ষা এবং বাইরের বিষয় নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে আলোচনা করতেন।

রাজনৈতিক জীবনঃ

ছাত্রজীবন থেকেই **বাংলার মানুষ এর মুক্তির রাজনীতির** সাথে সম্পৃক্ততা ঘটে তাজউদ্দীন আহমদের । ১৯৪৩ সাল থেকে তিনি বঙ্গীয় মুসলীমলীগের প্রগতিশীল অংশের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই তিনি পূর্বাঞ্চলের মানুষের মুক্তির পথানুসন্ধান শুরু করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিলার হিসেবে নির্বাচিত হন। কাউন্সিলার হিসেবে তিনি ১৯৪৫ ও ১৯৪৭ সালে দিল্লী কনভেনশনে যোগ দান করেন। স্বাধীনতা জন্য যেকোন দলীয় আন্দোলন কর্মসূচি প্রচারের উদ্দেশ্যে অভিভক্ত ভারতের বিভিন্ন অংশে তিনি প্রচারাভিযান চালান।

১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের পর থেকে ভাষার অধিকার। অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী যত তাজউদ্দীন তাঁর প্রতিটিতেই নিজ চিন্তা ও কর্মের সাক্ষর রাখেন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগ (বর্তমান বাংলাদেশ ছাত্রলীগ) প্রতিষ্ঠিত হয়; তিনি ছিলেন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একজন

গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষার প্রশ্নে যে বিক্ষোভ ও প্রতিরোধের যে আন্দোলন তাতে তিনি ছিলেন সক্রিয়।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামীলীগ গঠিত হয়। তিনি এর অন্যতম উদ্যোক্তার একজন ছিলেন। ১৯৫৩-১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঢাকা জেলা আওয়ামীলীগ এর সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে তরুণ তাজউদ্দীন সেই সময়ের পূর্বপাকিস্তানের মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ফকির আবদুল মান্নান কে বিপুল ভোটে পরাজিত করে এম,এল,এ নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে তিনি আওয়ামীলীগ এর সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এরপরের বছরগুলো তাজউদ্দীন আহমদ ও আওয়ামীলীগ এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৬ সালে তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলীয় সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান **বাঙ্গালির মুক্তির সনদ ৬ দফা** ঘোষনা করেন। উল্লেখ, ৬ দফার অন্যতম **রূপকার** ছিলেন **তাজউদ্দীন আহমদ** । আপন সাংগঠনিক দক্ষতা ও একনিষ্ঠতার গুনে তিনি ধীরে ধীরে বঙ্গবন্ধুর সহযোগী হয়ে উঠেন। এবছরই তিনি আওয়ামীলীগ এর সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। ৬দফার প্রচারাভিযান চলাকালে তিনি ১৯৬৬ সালের ৮ মে গ্রেফতার হন ও ১৯৬৯ এর গনভ্যুত্থানের ফলে ১২ ফ্রেব্রুয়ারী মুক্তিলাভ করেন। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানী জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আওয়ামীলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তাজউদ্দীন আহমদ ঐ নির্বাচনের জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু গণরায় অস্বীকার করে ১ মার্চ **পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান** জাতীয় পরিষদের অধিবেশন এ রায় **স্থগিত** করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় অভূর্তপূর্ব জনগণের কতৃর্ত্বের পরিপ্রকাশক নির্দেশনাবলী প্রণয়ণে তাজউদ্দীন অতুলনীয় সাংগঠানিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। এই আন্দোলন চলাকালেই ঢাকা পাক-সামরিক বাহিনীর সাথে আওয়ামীলীগ এর রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়। ১৬ মার্চ থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই আন্দোলনে তাজউদ্দীন আহমদ

দক্ষতা ও বিচক্ষনতার পরিচয় দেন শেখ মুজিবুর রহমানের সহযোগী হিসেবে।

২৪ মার্চ এ চূড়ান্ত বৈঠক হবার কথা ছিল, কিন্তু তা হয় নি। বরং ২৫ মার্চ সামরিক শাসক কাউকে কিছু না জানিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকেই ঢাকাসহ বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ এলাকায় নিরস্ত্র বাঙ্গালির উপর পরিচালিত হয় গণহত্যার পূর্বপরিকল্পনা। সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার নির্দেশে শুরু হয় হত্যা... গণ হত্যা। শেখ মুজিবুর রহমান কে গ্রেফতার করা হয়। এমন বিশ্বাসঘাতকতার নজির বিশ্ব ইতিহাস এ বিরল। গ্রেফতার হবার পূর্ব মূহুর্তে ২৫ মার্চ বাংলার জনতার দিকে ডাক দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান , শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ... স্বাধীনতার যুদ্ধ।

স্বাধীনতার পূর্বে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাজউদ্দীন আহমদ এর ভূমিকাঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের **অবর্তমানে নেতৃত্বের** মূল দায়িত্ব অর্পিত হয় তাজউদ্দীন আহমদে উপর।১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় ও তিনি সর্বসম্মতভাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়। **তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী**। ১৭ এপ্রিল এই সরকার মুজিবনগরে দেশী-বিদেশী সকল সাংবাদিক প্রতিনিধির সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহন সম্পন্ন করে। শুরু হয় বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ভাবে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ। বাংলাদেশের ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে মহান নেতা তাজউদ্দীন আহমদ এর অবদান অনন্য।

চরম প্রতিকূলতার সময় তিনি প্রায় একহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সামরিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক সকল বিষয়াদির দিক সংগঠিত করে তুলেন। প্রতিবেশী দেশ ভারতকে করে তুলেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের মৈত্রী। তাঁর সফল পথনির্দেশনায় মাত্র নয় মাসেই বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়, মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাজউদ্দীন আহমদ এর ব্যক্তিগত ত্যাগ, নিষ্ঠা, দক্ষতা, বিচক্ষনতা, স্বদেশপ্রেম সকলকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁর সফল নেতৃত্ব দানই তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন ও উল্লেখযোগ্য সময় ।

অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হল... পূর্ব-পাকিস্তানের নাম পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চির দিনের জন্য মুছে গেল। বাঙ্গালী ফিরে পেল সার্বভৌমত্ব।

স্বাধীনতা পরর্বতী স্বাধীন বাংলাদেশে তাজউদ্দীন আহমদ এর ভূমিকাঃ

মুক্তিযুদ্ধের পর তাজউদ্দীন আহমদ , বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে মন্ত্রী সভা সেই মন্ত্রী সভায় **অর্থ ও পাট মন্ত্রণালয়ের** দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের **প্রথম অর্থমন্ত্রী** হিসেবে তিনি আত্মনির্ভরশীল বিকাশমান অর্থনীতি এই যুদ্ধবিধস্ত রাষ্ট্রের কল্যাণে গড়তে চেয়েছিলেন, এজন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট ও ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর তিনি মন্ত্রীত্ব পথ থেকে সরে দাঁড়ান।

মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী, কারা?

পূর্ব-পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের বুকে একক আসন করে নেবে বাংলাদেশ নামের এক সম্পূর্ণ নতুন রাষ্ট্র, থাকবে তাঁর আলাদা মানচিত্র এবং সেই দেশটি হবে পরিপূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক ... এই মূলকথাটাই মেনে নিতে পারেনি যারা তারাই মুক্তিযুদ্ধের সময় **রাজাকার ,আল-বদর, আল-শামস** নামে পরিচিতি পায় পাক-বাহিনীর দোসর হিসেবে, এরাই যুদ্ধের সময় নিজেরই দেশের মানুষ এর উপর করেছে হামলা, চালিয়েছে লুটপাট, পুড়িঁয়েছে ঘর-বাড়ি, করেছে হত্যা, নিয়েছে মা-বোন এর মান-সম্মান-ইজ্জত। এরাই **মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী, দেশদ্রোহী, পাকিস্তানের দালাল।**

এদের মধ্যে প্রধান যিনি তিনি হলেন জামায়েত ই ইসলাম এর সাবেক আমীর গোলাম আযম, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শান্তি বাহিনীর প্রধান, তার সহযোগীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মতিউর রহমান নিজামী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, আব্দুর কাদের মোল্লা সহ আরো অনেকেই।

মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধের বিচারে তাজউদ্দীন আহমদ এর ভূমিকাঃ

মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধের বিচারে তাজউদ্দীন আহমদ এর ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ও যৌক্তিক, তিনি তাঁর মূল্যবান মতামতে ছিলেন সবার থেকে বিচক্ষণতা অনেক বেশী পারর্দশি।

যুদ্ধ-অপরাধীদের ব্যাপারে তাজউদ্দীন আহমদ একটা স্বচ্ছ পলিসি ছিল যা একেবারে কনভিকশন পলিসি ।

তাঁর মতামত ও পলিসি অনুযায়ী, যুদ্ধ-অপরাধ যে করেছে সে যদি **পাকিস্তান আর্মি** হয় তবে তাদের যেভাবে **ইন্টারন্যাশলান আইনে বিচার** করা দরকার, সেটা হবে।

আর সে যদি **বাঙ্গালি** হয়ে থাকে তবে তাকে **বাংলাদেশের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত না করে দেশের আইনানুসারে বিচার করতে হবে।**

সেক্রেটারি অব স্টেটস উইলিয়াম রজার্স যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি উত্থাপন করে বাংলাদেশকে নমনীয় হতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে নাইজেরিয়া বায়াফ্রার যুদ্ধাপরাধীদের মাফ করেছে তাই **বাংলাদেশ ও যেনো তাদের মাফ করেন।**

কিন্তু তাজউদ্দীন আহমদ বলেন যে, *বায়াফ্রায় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ফেডারেশন এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশে কিন্তু সংখ্যালঘুরা ই সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে অধিকার হরণের পাশবিক অত্যাচার করে পরাস্ত হয়। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরা ছিল ক্ষমতাসীন, তারা যে অপরাধ করেছে তার বীভৎস বিবরণ খোদ আমেরিকার সাংবাদিকরা লিপিবদ্ধ করেছেন। তবু*

বাংলাদেশ সমস্ত সেনাবাহিনীকে ছেড়ে দিয়ে মাত্র ১৯৫ জনের বিচারের দাবি করেছে। এই বিচার মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয়।

রজার্সের একটি প্রারম্ভিক মন্তব্য ঐতিহাসিকভাবে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, *আমাদের সম্পর্ক যখন ভাল তখন আপনার সাথে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগছে।* ***তাজউদ্দীন সাহেবের সপ্রতিভত উত্তর ছিল,*** *আমেরিকার জনগণ ও সংবাদ মাধ্যমের সাথে সব সময়ই কিন্তু উষ্ণ এবং বর্তমানে আপনাদের সাহায্য-সহায়তায় অনেক ধন্যবাদ।*

*[সম্পাদনায়ঃ সিমিন হোসেন রিমি; **তাজউদ্দীন আহমদ আলোকের অন্তর্তধারা (প্রথম খন্ড)** জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতের লেখা থেকে সংগৃহিত (পৃষ্ঠা-১১২থেকে ১১৩)] **

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে কাজ করার অভিযোগে কিছু সরকারি কর্মকর্তার পাসোপোর্ট বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয় । কিন্তু এদের মধ্যে অনেকেই ছিল যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেননি, সরকারী কাজ করেছেন, তাই বলে এদের অনেকেই কিন্তু শত্রুতা যে করেছে তা ঠিক নয়। তবে কিছু লোক হয়ত করেছে। দেশে তাদের আপনজন আছে, তাই তাদের বিষয়টি পূর্ণ বিবেচনা করা হউক ।তাদের দেশে আসতে দেয়া হউক, বাংলাদেশের আইন এ দেশদ্রোহীদের সাজা হবে; কিন্তু তারাও তো এই দেশে জন্ম গ্রহন করেছে, তাদের দেশে ফেরার অধিকার বাংলাদেশ সরকার তো খর্ব করতে পারেনা।

এমনি একটি কেস ছিল, এ জেড এম শামসুল আলমের, তার চাকরি ও গেল সাথে পাসপোর্ট ও, সে দেশে ফিরতে চায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সে আমেরিকায় থেকে আর্টিকেল লিখেছে তাও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, কিন্তু সে এখন অনুতপ্ত।

তাকে সিদ্ধান্ত **স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** দিতে পারেনই শর্তে দরখাস্ত জমাদানের অনুমতি দেয়া হল। পরবর্তিতে তা মঞ্জুর করা হয়েছিল, এবং তিনি দেশে ফিরতে পেরেছিলেন।

তিনি **তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত সচিব আবু সাঈদ চৌধুরীকে তাঁর** *এ ব্যাপারে মন্তব্য জানিয়েছিলেন সেটি হল;* ***‘এই কাজটি বাংলাদেশ সরকারের অন্যায়। যে দোষী তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার করাই যুক্তিযুক্ত, তার নাগরিকত্ব কেন বাতিল করবে সরকার? দ্বিতীয় বিশ্বের সময় জার্মান যুদ্ধ-অপরাধী যারা ছিল তাদের কি জার্মানি নাগরিকত্ব থেকে বাদ দেয়া হয়েছে? হয় নি। আর্ন্তজাতিক ট্রাইবুনালে এদের বিচার হয়েছে। তারপর যার যে শাস্তি সে তা পেয়েছে। গোলাম আযমের অপরাধের জন্য যদি তার ফাঁসি হয় তবে তা বাংলাদেশের মাটিতেই বাংলাদেশের নিয়মেই বিচার হবে’।***

তিনি* বলেন, *“গোলাম আযম নিশ্চয়ই বাংলাদেশে ফিরবে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে, তারপর আমরা তাকে যুদ্ধাপরাধের অপরাধে বিচার করব। বিচারে সে যদি খালাস হয়, তবে তাই হবে; আর যদি শাস্তি ভোগ করে তবে সে শাস্তি ভোগ করবে। সবচেয়ে বড় কথা আমার দেশের মানুষ জানবে তার অপরাধ। ঘৃণা করবে অপরাধীকে, প্রতিটি মানুষের মনে জাগ্রত হবে। আইনের বিচারে যা শাস্তি হয় সে তা পাবে”।

তিনি *বঙ্গবন্ধুকেও* *এই প্রসংগে বলেন যে,*

“প্রথম কথা *আমাদের কোন অধিকার নেই যে মানুষটা বাংলাদেশে জন্মেছে তাকে দেশের নাগরিকত্ব থেকে বহিষ্কর করার। এটা অন্যায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এই অন্যায় সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করা উচিত।*

দ্বিতীয় কথা, *আমি শামসুল আলমের দরখাস্ত পাঠিয়েছি যেটা এখন আপনার কাছে আছে, সেটা দেখেন এবং সে যে অন্যায় করেছে এই কারণে তাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে দেশের আইন অনুযায়ী বিচার প্রয়োগ করেন।*

তিনি আরো বলেন, গোলাম আযমকেও *দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই সমস্ত লোকরা বিদেশে থাকলে তো তাদের শাস্তি তো হল না। এই দেশের মানুষতো জানতেই পারলনা যে তারা কী জঘন্য অপরাধ করেছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়। সুতরাং দেশে তাদের আসতে হবে।*

দেশে ফিরে আসার পর তাদের বিচার করতে হবে। এই বিচারে যে শাস্তি হবে সেই শাস্তি তাদের দেয়া হবে, যদি কেউ বেকসুর খালাস পায় সেটা সে পাবে" ।

*[সম্পাদনায়ঃ সিমিন হোসেন রিমি; **তাজউদ্দীন আহমদ আলোকের অন্তর্তধারা (প্রথম খন্ড)** জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীর লেখা থেকে সংগৃহিত (পৃষ্ঠা-১৫২থেকে ১৫৫)]**

আইন শাসনের প্রতি তাঁর যে বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা তা সত্যি অতুলনীয়। তিনি অপরাধীর বিচার চেয়েছিলেন-সেই বিচার এদেশের মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে চিরকাল। যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা থাকবে, দেশপ্রেমের পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে মানুষ সত্যিকারের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার শক্তি অর্জন করবে।

তাই মহান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাজউদ্দীন আহমদ এর ভূমিকাটি মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধপরাধীদের বিচার কার্য সম্পন্ন করার যথোপোযুক্ত দিক-নির্দেশনাটি তুলে ধরেছিলেন, যার মাধ্যমে এই বিচার তখনকার যুদ্ধের পরপর করলেই তা বেশ গ্রহণযোগ্যতা পেত ও নির্যাতিত মানুষের মনের হাহাকার কিছুটা হলেও সান্ত্বনা পেত, স্বজন হারাবার ব্যথা ভুলতে পারত, পেত দেশদ্রোহীরা শিক্ষা, নতুন প্রজন্ম হতো গর্বিত। কিন্তু, হায় ভাগ্যে নির্মম পরিহাস, এই বিচার আজও প্রকৃতভাবে অকার্যকর রয়ে গেছে। জাতি পায়নি সঠিক চালক, করেছে ভুল, হয়নি বিচার আজ ৪৩ বছর পরও।

বিভিন্ন ভাষণ ও পত্রিকায় তাজউদ্দীন আহমদ এর যুদ্ধাপরাধীদের প্রসংগে অভিমতঃ

ডিসেম্বর ৮, ১৯৭১ সোনার বাংলা গড়তে হবে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের **বেতার ভাষণে** যুদ্ধাপরাধীদের প্রসংগে বলেন, *"সকল শত্রু ও রাজাকারের কাছে আমার*

আহ্বান অস্ত্র ফেলে দিন, আত্মসমর্পণ করুন। এই উপায়ে এখনও আপনারা আত্মরক্ষা করতে পারেন। সংগে সংগে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের কাছে আমার আহ্বান কোন অবস্থাতেই আইন নিজের হাতে তুলে নিবেননা। মনে রাখবেন যে, অপরাধীকে আইন মোতাবেক শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব সরকারের এবং তা সরকার পালন করবে''।

ডিসেম্বর ২৪, ১৯৭১ শুক্রবার; দৈনিক পূর্বদেশ এর স্টাফ রিপোর্টার এর প্রতিবেদন এ আসে তাঁর বক্তব্যটি তুলে ধরা হয় এভাবে;

যারা শত্রুদের ইচ্ছাকৃতভাবে সহযোগিতা করেছে তাদের ক্ষমা করা হবে না। তাদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে বিচার করা হবে। তিনি আইন স্বহস্তে গ্রহণ না করার জন্য জনগণকে উপদেশ দেন।

ডিসেম্বর ২৯, ১৯৭১ বুধবার; দৈনিক পূর্বদেশ এর স্টাফ রিপোর্টার এর প্রতিবেদন এ আসে তাঁর বক্তব্য এভাবে;

"সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে গত নয় মাসে যে সব যুদ্ধবন্দি গণ হত্যা ও অন্যান্য অপরাধীর জন্য দায়ী হবে তাদের বিচার করা হবে"।

মার্চ ২৩, ১৯৭২ বৃহস্পতিবার; দৈনিক পূর্বদেশ এর স্টাফ রিপোর্টার (ঢাকা,২২মার্চ–বাসস) এর প্রতিবেদন এ দালালদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রসঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের বক্তব্য আসে এভাবে;

*বর্বর হানাদার পাক বাহিনীর সাথে যোগসাজশকারী এবং তাদের অনুচরবৃত্তির অভিযোগে **বর্তমান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের** প্রতিটি ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থন এর সুযোগ দেয়া হবে। অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আজ এই নিশ্চয়তা দেন। আটক ব্যক্তিরা যাতে ন্যায় বিচার পায় সেজন্য এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আজ তিনি হঠাৎ কারাগার পরিদর্শনে যান। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি হানাদার পাকবাহিনীর সাথে যোগসাজশ করে বাংলাদেশে নরামেধ যজ্ঞের সৃষ্টি করেছিল তাদের একজনও রেহাই পাবেনা। চারঘন্টা ধরে মন্ত্রী ইয়াহিয়া সরকারের পূর্ব*

পাকিস্তানের তথাকথিত গভর্ণর ডাঃএ এম মালেক। জনাব খান এ সবুর, জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী ও জনাব সোলায়মানসহ বেশ কিছু দালাল হিসেবে অভিযুক্তদের সাথে কথা বলেন।কেন্দ্রীয় কারাগারে ***বর্তমানে ৯ হাজার ৪৯৩ জন*** *দালালির অভিযোগের বিচারের দিন গুনছে। এদের মধ্যে* ***৫১ জনকে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা*** *দেয়া হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে* ***৫০ জন মহিলাও*** *রয়েছেন।**

ডিসেম্বর ২৫, ১৯৭২ সোমবার; দৈনিক পূর্বদেশ এর স্টাফ রিপোর্টার (টোক,কাপাসিয়া ডিসেম্বর ২৪–বাসাস) এর প্রতিবেদন এ দুর্বৃত্ত দমনে সরকারকে সাহায্য করার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে,

তাদের প্রতি সরকার যে ক্ষমা সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন ইতিহাসে তার নজীর নেই। নিজেদের শুধরে নেবার জন্য সরকার তাদের সময় দিয়েছেন। জনগণ যদি তাদের ক্ষমা করে দেন সরকারের বলার কিছুই থাকবেনা। কিন্তু অন্যথায় তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।*

করুণ পরিণতি এবং যুদ্ধপাপীদের বিচার স্থগিতঃ

স্বাধীনতার প্রায় দুই বছর দশ মাসের মাথায় জনাব তাজউদ্দীন আহমদ মন্ত্রীত্ব পদ থেকে পদত্যাগ করেন । **বঙ্গবন্ধু সাথে তাঁর মতপার্থক্যের জন্য বিচ্ছেদ** তৈরী হয়, যা মূলত **খন্দকার মোশতাক** সূক্ষভাবে সৃষ্টি করতে সাফল হন। ফলে অনেক ভুলের পাহাড় জমতে জমতে **১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট, এই খন্দকার মোশতাকই সামরিক বাহিনীর সহায়তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট ক্ষমতা দখলকারী ঘাতকদের হাতে সপরিবারে নিহত হলেন** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান । একই দিন তাজউদ্দীন আহমদকে গৃহবন্দি করা হয় ও পরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

বন্দিদশায় ***৩ নভেম্বর , ১৯৭৫*** কারাগারের সমস্ত নিয়ম ভংগ করে নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়ে ঘুম থেকে তুলে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয় ***বাংলাদেশের চার জাতীয় নেতাদের, তাঁরা হলেন- সৈয়দ নজরুল***

ইসলাম, এম. মনসুর আলী, এ .এইচ. এম . কামরুজ্জামান এবং তাজউদ্দীন আহমদকে।

ফলে তাজউদ্দীন আহমদের সত্যিকারের সোনার বাংলাদেশ গড়ার কোন স্বপ্নই পূরণ হয়নি। জাতির পিতা এবং তাঁর একান্ত বাধ্যগত সহযোগী বিশ্বস্ত যোদ্ধা এই চার জাতীয় নেতা নির্মম মৃত্যু বাঙ্গালি জাতিকে করেছে দারুণভাবে পঙ্গু , অভিভাবক হাঁরা, সৎনেতা বিহীন এক তিমির জাতিতে পরিণত, **তাই সেই অর্থে মুক্তিযুদ্ধের সময় যারাই মানবতাবিরোধী - যুদ্ধাপরাধ করেছে তাদের সঠিক ও যথোপোযুক্ত বিচার তো প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয় ।**

বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি ও আপামর জনতার দাবীঃ

১৯৯২ সালে শহীদ জননী " জাহানারা ইমাম" যুদ্ধাপরাধের বিচার এর দাবিতে সোহরাওয়াদী উদান্যে গণ-আদালত বসিয়েছিলেন। সেই উদান্যের পাশেই **শাহাবাগ চত্বর**– এই চত্বরই অতীতের সেই সব পাপীদের যারা যুদ্ধাপরাধী , তাদের অসমাপ্ত বিচার সমাপ্ত করার পণ করেছে এই নতুন প্রজন্ম। এই বছরের ফ্রেবুয়ারি মাস থেকে শুরু করে এখন অব্দি দীর্ঘ চার মাসব্যাপী জনতা ও তরুণ প্রজন্ম যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। সকল চিহ্নিত রাজাকারদের ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত তারা রাজপথ ছাড়বে না।

২০০৮ সালের **আওয়ামালীগ এর নির্বাচনী ইস্তেহারে** অন্যতম দিকই ছিল **যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসংগ।** তারা বলেন , তারা পরবর্তীতে সরকার গঠন করলে তারা উক্ত সকল অপরাধীদের বিচার করবে। এই অন্যতম কারণেই আওয়ামীলীগ জনতার ভোটে সরকারীদল হিসেবে জয় লাভ করে।

পরবর্তিতে **২১** জুলাই **২০১০** থেকে তদন্ড শুরু হয়, **১৮** ডিসেম্বর **২০১১** এ অভিযোগ দাখিল হয়, **২৮** মে **২০১২** এ অভিযোগ গঠন হয়।

অবশেষে এই বছর **২১ জানুয়ারী , ২০১৩** আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২, **বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের** নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইবুনাল জামায়াতে-ই-ইসলাম এর সাবেক সদস্য মাওলানা **আবুল কালাম আযাদ** এর ফাঁসির রায় ঘোষিত হয় , গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে এ রায় দেয়া হয় ।যদিও তিনি পলাতক। জাতি এতদিনে প্রকৃত রায় পায়, জাতি খুশি হয়।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ একই দোষে **দোষী জামায়াতে-ই-ইসলাম এর সহকারী সেক্রেটারি জেনারাল আবদুল কাদের মোল্লাকে** যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দেয়া হয় । এরই রায়ের প্রতিবাদে শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে আন্দোলন গড়ে ওঠে।

কাদের মোল্লাকে ঘিরে চলমান আন্দোলন আশার আলো দেখতে পেল **গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ঘোষিত** রায়ের মাধ্যমে ।

ঐ দিন যুদ্ধাপরাধী-রাজাকার **জামায়াতের ইসলামিক নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর** ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়, এতে জাতি খুশি হয় , ৪৩ বছর এর বহুপ্রতীক্ষীত একটির ফলাফল পেয়ে তারা আনন্দে উদ্বেলিত , দিশেহারা, বাংলার ঘরে ঘরে আজ আনন্দ।

অবশেষে **মহান নেতা বাংলার তাজ তাজউদ্দীন আহমদ এর অসম্পূর্ণ স্বপ্ন** পূরণ হতে চলেছে।

বর্তমানে প্রবীণসহ নবীনদের এক দাবি **"রাজাকার এর ফাঁসি চাই" ।** আর্ন্তজাতিক ট্রাইবুনালের অধীনে এবং বাংলাদেশের আইনের অধীনে যুদ্ধাপরাধী এবং দেশদ্রোহীদের বিচারের দাবি আপামর জনতার। একাত্তর এর নিরীহ নিরস্ত্র বাঙ্গালির উপর নিশংস হত্যাকান্ডের পাক-হানাদার বাহিনীকে যারা বাঙ্গালি হয়েও সাহায্য করেছিল, করেছিল মা-বোন এর উপর অত্যাচার; সেই সব পাষান্ড মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের যারা রাজাকার হিসেবে পরিচিত তাদের ন্যায্য বিচারের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন তাজউদ্দীন

আহমদ আর এখন উত্তাল শাহবাগ, উন্মত্ত তরুণ সমাজ , সমগ্র বাংলাদেশবাসী।

শেষ কথাঃ

তাজউদ্দীন আহমদ, যিনি ছিলেন এই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, যিনি আজীবন খ্যাতির মোহে না দৌড়ে ছুটেছেন জনতার কল্যাণের স্বার্থে, যিনি ছিলেন সৎ, উদার ও নিরপেক্ষ, বাঙ্গালী জাতির প্রতি পরমভাবে নিবেদিত একজন সত্যিকার রাজনৈতিক ব্যক্তি। প্রচারবিমুখ ত্যাগী, নির্লোভী, কৃতী মানুষটিকে হত্যা করল ক্ষমতা লোভী ও স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকের দল।

আইন শাসনের প্রতি তাঁর যে বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা তা সত্যি অতুলনীয়। তিনি **মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধে অপরাধীদের বিচার চেয়েছিলেন- তিনি চেয়েছিলেন সেই বিচার এদেশের মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে চিরকাল।** যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা থাকবে, দেশপ্রেমের পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে মানুষ সত্যিকারের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার শক্তি অর্জন করবে।

নির্মম এই মহান মৃত্যুই উদ্ভাসিত করে বাংলার তাজ 'তাজউদ্দীন আহমদকে' । আলোকের অন্ততধারায় তাঁর মহিমান্বিত রূপটি প্রজ্বলিত থাকবে অম্লান - অর্নিবাণ শিখায়। তাঁর কর্ম তাঁকে করেছে প্রশংসনীয়, যা এদেশের আকাশ বাতাস মনে রাখবে এক চিরন্তন সৎ দেশপ্রেমী হিসেবে, যা তিনি তাঁর আজীবন এর শ্রম সাধনায় একমাত্র পবিত্র কর্তব্য বলে মেনেছেন , করেননি অন্যায়ের সাথে আপোষ । বাঙ্গালি জাতি তথা বাংলার ইতিহাসে বাংলাদেশকে পূর্ণাংগ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মুক্তি এ কঠিন লড়াইয়ে তাঁর অবদান চির অম্লান, গভীর, অনস্বীকার্য।

রেফারেন্সঃ

*১.[সম্পাদনায়ঃ সিমিন হোসেন রিমি;**তাজউদ্দীন আহমদ আলোকের অনন্তধারা(প্রথম খন্ড)** জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত লেখা থেকে সংগৃহিত (পৃষ্ঠা-১১২থেকে ১১৩)]*

*২.[সম্পাদনায়ঃ সিমিন হোসেন রিমি;**তাজউদ্দীন আহমদ আলোকের অনন্তধারা(প্রথম খন্ড)** জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীর লেখা থেকে সংগৃহিত (পৃষ্ঠা-১৫২থেকে ১৫৫)]*

*৩.সম্পাদনাঃ সিমিন হোসেন রিমি; **তাজউদ্দীন আহমদ ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃষ্ঠা-[১৬৬,১৭৬,১৭৯,২১২ ২৯৭]***

সূচীপত্র

ভূমিকা

ব্যক্তি তাজউদ্দীন আহমদ

স্বাধীনতার পূর্বে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাজউদ্দীন আহমদ এর ভূমিকা

স্বাধীনতা পরর্বতী স্বাধীন বাংলাদেশে তাজউদ্দীন আহমদ এর ভূমিকা

মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী, কারা?

মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধের বিচারে তাজউদ্দীন আহমদ এর ভূমিকা

বিভিন্ন ভাষণ ও পত্রিকায় তাজউদ্দীন আহমদ এর যুদ্ধাপরাধীদের প্রসংগে অভিমত

করুণ পরিণতি এবং যুদ্ধপাপীদের বিচার স্থগিত

বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি ও আপামর জনতার দাবী

শেষ কথা

রেফারেন্স

সংযুক্তিঃ

সিডি রাইট

বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মেমরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড রচনা প্রতিযোগীতা ২০১৩

রচনার বিষয়ঃ

মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধের বিচারে তাজউদ্দিন আহমদের ভূমিকা

প্রতিযোগির নামঃ

সৈয়দা আবিদা ফারহীন বুশরা

ক্রমিক নং-৩০৯

সপ্তম সেমিস্টার

চতুর্থ বর্ষ

সেশনঃ২০০৯-২০১০

সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

শামসুন নাহার হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।।

মোবাইলঃ ০১৬৭১৮১৯৪৩২, ০১৯১৫৮৫৯৬০৩

জমাদানের ঠিকানাঃ

বিভাগীয় অফিস,শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।।ঢাকা-১০০০।।

জমা দানের তারিখঃ ০৯ মে ২০১৩